জীবনানন্দের ছোটগল্প ঃ অপরিচিত গভীরতা উন্মোচন

দীপেন্দু চক্রবর্তী

কবি ও গল্পকারের সমাহার বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে খুব বেশি নেই । আর উভয় ক্ষেত্রে পারদর্শিতার নজির আরো কম । কাব্যে যাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধি তিনি গল্প-উপন্যাসে তেমন সচ্ছন্দ নন, আবার ঔপন্যাসিকের কাব্য প্রচেষ্টা প্রায়শই কাঙ্ক্ষিত মান অর্জনে ব্যর্থ- এরকম ঘটনা খুবই পরিচিত । কিন্তু একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার মতো ঃ কবি যখন গল্প লেখেন তখন সাধারণত তা তাঁর কবিতারই স্বাদ বহন করে; গল্পকার যখন কবিতা লেখেন তখন তখন তাঁর কবিতায় ফুটে ওঠে গল্পকারের নানান চিহ্ন । একথা যেমন এমিলি ব্রন্টি, টমাস হার্ডি, ডি এইচ লরেন্স, ফিলিপ লারকিন সম্বন্ধে সত্য তেমনি আমাদের রবীন্দ্রনাথ, প্রেমেন্দ্রে মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, বনফুল অচিন্ত সেনগুপ্ত ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধেও বলা যায় । জীবনানন্দ দাশও ব্যতিক্রম নন । তাঁর গল্প তাঁর কবিতার মতই -- ভাব ও ভাষায়, ভাবনা ও কল্পনায়, পরিবেশ ও বিষয়ে । দূটি ভুবনের একই আবহাওয়া, একই প্রাকৃতিক আকর্ষণ, একই রকম জীবন ও মৃত্যু চেতনা । তবু তাঁর গল্প কবিতার ছায়া হয়ে থাকে না, নিজস্ব সত্তা অর্জন করে নেয় । বরং বলা যেতে বারে, জীবনানন্দের কবিতা যদিও বা রবীন্দ্রোত্তর রম্যান্টিক ঐতিহ্যের অংশীদার, তাঁর গল্প রম্যান্টিক উপকরণ সত্ত্বেও প্রথাবিরোধী, শুধু তাঁর সমকালের প্রেক্ষিতেই নয়, আজকের বিচারে, এবং সেই কারণে এখনও অনন্য । বাংলা গল্পের ভান্ডারে বৈচিত্র্যের অভাব না থাকলেও তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল আখ্যানের সুপরিকল্পিত কাঠামো । গল্পের আদ্য-মধ্য-অন্তের অ্যারিস্টটলীয় বিন্যাসে যে নাটকীয় চমক সৃষ্টি করেছিলেন মোপাসাঁ তার অনুসরণ তো আমরা পেয়েইছি । তার পাশাপাশি পেয়েছি কিঞ্চিৎ শিথিল অথচ গতিশীল আখ্যানের বহুমুখী বিকাশ। জীবনানন্দ দাশের গল্পে আখ্যানের গুত্ব নেই বললেই চলে । সেখানে কোনো বিশেষ ঘটনার বিবরণ আমাদের বেশীক্ষণ আটকে রখে না । তার পবিবর্তে একটি বিশেষ মুহূর্তে বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যক্তি-মানুষের প্রতিত্রিয়াই উপজীব্য হয়ে ওঠে । বাংলা গল্পের একটি নতুন ধারা জীবনানন্দ সৃষ্টি করে যেতে পারতেন যদি তাঁর গল্পগুলো ঠিক সময়ে পরেকাশিত হত ।

এই ধারাটির সঙ্গে ক্যাথারিন ম্যানসফিলডের আখ্যান শৈলীর সাদৃশ্য ম্যন আসতে পারে । আপাততুচ্ছ অনুপুঙ্খ ও ভাবনার জাল বনে বনে জীবনের কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্তকে ধরে ফেলার তন্ময়তায় জীবনানন্দ ম্যানসফিলকেও ছাড়িয়ে যান । এর কারণ তাঁর প্রধান চরিত্ররা আনেকটা তাঁর মতই কল্পনাপ্রবণ সংবেদশীল, অথচ আশ্চর্য রকমের নির্লিপ্ত । পেশা ্য সামাজিক অবস্থানের পার্থক্যেও তাদের মেজাজ একই রকম । গভীর অনভবসত্তির পাশাপাশি এক নিরাসক্ত দার্শনিক পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা দাদের মধ্যে এক পারিবারিক সাদৃশ্য স্পষ্ট করে তোলে ।

অবিনাশ ঘোষাল একটা কাপড় কাচা সাবানের কারবার করে (কণার পথ ধরে), নির্মলার চাকুরে সবোমী (মায়াবী প্রসাদ), উকিল ভবানী (অস্পষ্ট রহস্যময় সিঁড়ি), ব্যবসায়ী সোমনাথ (কুড়ি বছর পর ফিরে এসে), চালচুলোহীন সোমেন (গ্রাম ও শহরের গল্প) প্রুফ-রিডার শান্তিশেঘর -এ ছাড়া যাদের পেশা সম্বন্ধে লেখক নীরব তারাও 'অর্থ নয়, কীর্তি' নয়, সচ্ছলতা নয়, অন্তর্গত রক্তের ভিতরে যে 'আরো-এক বিপন্ন বিস্ময় খেলা করে' তার তাড়নায় জীবনের আনাচে-কানাচে কী যেন খুঁজে চলে । কবি জীবনানন্দের মতই এদের তীবরে অতীতকাতরতা ; স্মৃতির ধূসরতা বর্তমানকেও নিস্তেজ করে ফেলে । 'ধূসর' শব্দটি কবিতার মত গল্পেও বরাবর উচ্চরিত । জগত ও জীবনকে এক রহস্যময় কুয়াশার মধ্য দিয়ে দেখা ঃ 'কুয়াশা' কথাটাও বহু ক্ষেত্রে অপরিহার্য হয়ে ওঠে । ক্লান্তিবোধেও জীবনানন্দের চরিত্ররা নিকট আত্মীয়, এবং তাই হেমন্ত ও শীতের পটভূমিকা এতবার উপস্থিত । অপরাহ্নের মেজাজ শুধু প্রাকৃতিক পরিবেশে নয়, মানব চেতনাতেও দীর্ঘস্থায়ী । অসুস্থতা ও মৃত্যু ঘুরে ফিরে আসে বহু গলেপ (মৃণাল, কণার পথ ধরে, অস্পষ্ট রহস্যময় সিঁড়ি, সোনালি আভায়, সাধারণ মানুষ, বৃত্তেতের মতো, ছায়ানট), কিন্তু কোনো ভয়ংকর অবিজ্ঞতার কথা নেই । একটা শান্ত নিরাসক্ত দৃষ্টিতে রোগ ও মৃত্যু আর পাঁচটা দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মতই আটপৌরে হয়ে ওঠে । আবার তারই মধ্যে উঁকি দিয়ে যায় মানব-জীবনের গভীরতম উপলব্ধি-- বিকাশ ও বিনাশের টানা-পোড়েন । পৃথিবী ও নক্ষত্রলোক - এই দুই মেতে ঘোরা-ফেরা-করে জীবনানন্দের গল্পের অনেক মানুষ । পাখির উপমা এ কারণেই বারবার আসে, আকাশ ও নীড়ের অপরিহীর্যতা । স্থূল বৈষয়িকতার মানুষেরা এসবের ধার ধারে না । জীবনানন্দের আনেক গল্পে এই বৈপরীত্যের সচেতন উপস্থাপন লক্ষণীয় । 'গ্রাম ও শহরের গল্পে' প্রকাশ ও সোমেন, যেমন । শচী নিজেই বোঝে তার স্বামী প্রকাশবাবুর 'বরাবরই জীবনের ব্যবসায়ে জিতবার একটা ফিকির ছিল' আর সোমেন চায় 'জীবন' । প্রকাশ নিজেও সে সম্বন্ধে সচেতন ঃ 'প্রকাশের জীবন কী ! অফিসে একটা গাধার মত খাটছে..... জীবন আর কোনো প্রয়োজনই ওর নেই--প্রয়োজন বোধই নেই ।' রম্যান্টিক কবি জীবনানন্দ কিন্তু এই ত্রিভুজাকার প্রেমে সোমেনকে জয়ী করেননি । তা
র কাছে পাড়াগাঁয়ে বক মোহনা শচীর সঙ্গে যে অন্তরঙ্গতার স্মৃতি এখনও অম্লান, বালীগঞ্জের একটি বৈঠকখানায় তার পুনরাভিনয় সম্ভব নয় । যা অতীত তা অতীত বলেই মধুর, কিন্তু বাস্তবের দাবিও অপ্রতিরোধ্য । জীবনানন্দের রম্যান্টিক চেতনায় অতীত ও বর্তমানের টেনশন সদা সত্রিয় বলে রম্যান্স রচনা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি ; মিষ্টি প্রেমের গল্পও না ।

প্রেমের স্বাদ তাঁর গল্পে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়ে আসে না, তা স্বপেনের মত আচ্ছন্ন করে রাখে । একদিকে স্ত্রীরূপে নারীর অপসৃয়মান আবেদন, অন্যদিকে অতীতের কোন এক নারীর স্মৃতি যা ধূসর হয়ে গেলেও হাতছানি দেয় । জীবনানন্দের পুষেরা অনেকেই এইভাবে না-পাওয়া নারীর স্মৃতি নিয়ে সংসার জীবনকে সহনীয় করে তোলে । বিবাহ, দাম্পত্য জীবন, সংসার এই সব পুষদের গভীর গেপন নিঃসঙ্গতাকে আরো বাড়িয়ে দেয় । অথচ সংসারহীন একক জীবনেও এদের তৃপ্তি নেই । 'স

াধারণ মানুষের' ব্যোমকেশ চায় তার স্ত্রী কমলা সন্তান প্রসবের সময় মারা যাক, এতটাই বীতশ্রদ্ধ সে দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে, কেননা 'সে আমাকে পায়নি, আনিও ত াকে পাইনি ।' কাশীনাথ ব্যাচেলর, কিন্তু ব্যোমকেশের নেতিবাচক অভিজ্ঞতা তার ঘর বাঁধার স্বপ্নকে একটুও টলাতে পারে না । ব্যোমকেশ পাখি হয়ে উড়ে যেতে চ ায়, কাশীনাথ এমন পাখির তো নাম করতে পরে না যা শেষ পর্যন্ত নীড়ে ফিরে আসে না । ব্যোমকেশের নীড়ের ধারণাও রম্যান্টিকের--'কিন্তু কত পাখির নীড় থাকে পাহাড়ের ওপর, আকাশ ও নক্ষত্রের নীচে--'। গল্পকার জীবনানন্দ কোনো বিচারে বসেন না । শুধু দুই বিপরীত মনোভাবের দুটি মানুষকে মুখোমুখি বসিয়ে দেন । গল্পের শেষ হয় যেখানে সেখানে 'চারদিকে শিশির, চারদিক শূন্যতা ।'

আর এক ধরনের বেঁচে থাকার কথা বলেন জীবনানন্দ, যেমন 'আস্বাদের জন্ম' গল্পে, যেখানে জীবন ও মৃত্যুর সীমানা প্রায় মুছে যায় । সোমনাথ দার্শনিক নির্লিপ্তত ায় নিজের পরিবার পরিজনকে লক্ষ করে যায় । গল্পের শেষে সোমনাথের গর্ভবতী স্ত্রী ও একটি গর্ভবতী কুকুরের মখোমুখি অবস্থান বেঁচে থাকার নিতান্তই প্র াকৃতিক প্রবৃত্তিকে অন্য এক তাৎপর্য দান করে । জৈবিক তাড়নার আপাত তুচ্ছ এরকম একটি ঘটনাই অন্যভাবে ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে 'বসনার দেশ' গল্পে যেখানে একটি গাভীকে অনুসরণ করে একটি ষাঁড়, এবং তারই পাশাপাশি একটি পুষ ও নারীর অবদনিত কামনার তির্যক সংলাপ এগিয়ে চলে । অবদমনের ফ্রয়েডীয় রূপ ায়ণ যা কল্লোল যুগে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল, জীবনানন্দের গল্পে নানান মুহূর্তে হাজির হয় (ভালোবাসার সাধ, বৃত্তের মতো, এক সেতুর ভিতর দিয়ে) । অথচ যৌনতার শারীরিক খুঁটিনাটির প্রয়োজন হয় না । ছেচল্লিশ বছরের হেডমাস্টার সমরেশবাবু (এক সেতুর ভেতর দিয়ে) বিস্মৃত প্রায় এক নারীর চিন্তায় বিভোর হয়ে শেষে একদিন সে তার অবদমিত যৌন তাড়নায় মুখোমুখি হয়ে উন্মাদ হয়ে ওঠে, অথচ কী কাব্যিক গভীরতায় তা ধরা পড়ে জীবনানন্দের ভাষায় ঃ 'জীবনের স্ব াভাবিক প্রবহমান লালসা ঘিরে ধরল তাকে । নক্ষত্র কামনা চূর্ণ হয়ে গেল । স্পর্ধা আগুন হয়ে উঠল তার । হেমন্তের ঝড়ে একটা বিরাট বৃক্ষের অসংখ্য বীজের মতো শরীর টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে পড়তে লাগল তার । ..... তারপর অনেক রাতে খানিকটা ভিজে-ঠান্ডা অবস্থায় গ্ন দুর্বল ম্যাজমেজে ও বিরস মানুষটিকে, হেডমাস্টারকে তার বিছানার ভেতর খুঁজে পাওয়া গেল ।'

কাব্যিকতা জীবনানন্দের গল্পে সময় সময় অবশ্য কিঞ্চিৎ পীড়া জাগায়, একথা মানতেই হয় । 'নক্ষত্র' কথাটা' বারবার ব্যবহারে ক্লিশের মত মনে হয় । প্রাকৃতিক বর্ণনায় আরো কিছু উপমাও পুনরাবৃত্তিতে অকেজো হয়ে যায়, যেমন, শিঙের মত বাঁকা নীল চাঁদ । কবিতায় যা স্বাভাবিক মনে হয় গদ্যে তাকেই যেন খানিকটা কৃত্রিম লাগে, যেমন 'খইয়ের ফুলের মতো সোনালি রঙের আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে ।' কিছু শব্দ ও উপমা যেন জীবনানন্দের প্রিয় অবসেসন -- ফিরোজা রঙের বাগ ান, জাফরান রঙের মেঘ । 'হাসি যেন তার অতিরিক্ত পাকা জামের আস্বাদের মতো' -- এমন উপমা নির্মলার মত পাকাপোক্ত গিন্নী সম্বন্ধে আমাদের যে-ধারণা হয় ত াতে হঠাৎ বাদ সাধে । তবু বলতে হয় ভাষার এই সচেতন প্রয়োগই জীবনানন্দের গল্পকে 'ঘনীভূত' করে তোলে ('ঘনীভূত' কথাটাও নিনি বারবার ব্যবহীর করেন) এবং তাঁর সমকালে এমন পরীক্ষা ছিল দুর্লভ । ভাষাকে কাব্যিক স্তর থেকে আটপৌরে স্তরে নামিয়ে এনে াবার আগের স্তরে ফিরে যাবার দক্ষতা ।

তাঁর প্রথম দিককার গল্পে বা উপন্যাসে ভাষার এই বহুস্তর বিন্যাস ছিল না । পূর্ণিমা, মেয়ে মানুষ, বিসেব-নিকেশ, ইত্যাদি গল্পে ভাষাও যেমন সাবলীল ও স্বচ্ছ, তেমনি ঘটনার প্রাধান্যও বেশি । কবি জীবনানন্দের মত গল্পকার জীবনানন্দও ধীরে ধীরে পরিপক্কতা অর্জন করেছেন, শুধু ভাষায় নয়, সামগ্রিক রূপায়ণেও । তিনি শু করেছিলেন চেখভের ধারায়, কিন্তু অচিরেই আরো এক ধাপ এগিয়ে যান পরিচিত অভিজ্ঞতার অপরিচিতগভীরতা উন্মোচনের দিকে । ঠিক এইখানেই জীবন ানন্দ অনন্য হয়ে হঠেন । বর্ণনার পরিমিত, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ, যথাস্থানে ব্যঞ্জনা, কখনো চেতনার গভীরে অবগাহন, কখনো তার বাইরে স্বচ্ছন্দ বিচরণ, এ সবের মধ্যে ঝিসাহিত্যের কোনো কোনো কণ্ঠস্বর শোনা গেলেও জীবনানন্দ ছোটগল্পের এমন একটা আদল তৈরি করেছিলেন যার জন্য বংলা পাঠক তখন প্রস্তুত ছিলেন না ।

জীবনানন্দের গল্পে সমকাল সেভাবে ধরা পড়ে নি যেভাবে তাঁর সমসাময়িক গল্পকারদের লেখায় আমরা দেখতে পাই । তিরিশের দশক থেকে বাংলা উপন্যাস ও গল্পে যে-ধরনের সমাজ বাস্তবতার চর্চা শু হয়েছিল জীবনানন্দ তাতে আকৃষ্ট

হননি । আবার তাঁর কাব্যের যে-রম্যান্টিকতা সমকালীন আধুনিকতার বিপরীতে নিজস্ব জায়গা করে নেয় তার ঘেরাটোপেও গল্পকার জীবনানন্দ আটকে থাকেন না । অথচ বাস্তবতা ও রম্যান্টিকতার এক জটিল বুনন মনোযোগকে সবসময় সচল রাখে । যদিও একটি বিশেষ সময়ের মানুষ-মানুষীদের সম্পর্ক ও অন্তর্জগত তাঁর মুখ্য উপজীব্য তিনি সেই বিশেষ সময়ের পথ ধরেই যেন বৃহত্তর এক মানচিত্রে মানুষের অবস্থান চিহিত করার চেষ্টা করেন সেখানে সমকালীন রাজনৈতিক ও সামা জিক ঘটনার চেয়েও গুত্বপূর্ণ ভৌগলিক পটভূমিকায় বিধৃত মানুষের চিরকালীন কিছু আকুতি । 'মায়াবী প্রাসাদের' নায়ক যেমন বলে, 'না, না । জানালা বন্ধ করো না । টেবিলের পাশে এইখানে বসে সমস্ত আকাশটা দেখতে পচ্ছি আমি, আমার মনে হয় আমি শুধু তোমার সঙ্গেই কথা বলছি না, এই আকাশ ও অজস্র তারায় স ামনে বসে যত তুচ্ছ কথাই বলি না কেন, ... হৃদয়ের ভিতর একটা গাঢ়তা আসে তাই--জানালা বন্ধ করলে মনে হবে আমি যে-কোনো নরীর যে-কোনো স্বামী, তুমি যে-কোনো স্ত্রী যে-কোনো পুষের, একটা আশ্চর্য গাঢ়তা ও বিস্ময়ের আবহাওয়া নষ্ট হয়ে যাবে ।' এ কারণেই মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন সংগ্রামের পাশাপাশি তিনি সেই আকাঙক্ষা ও স্বপ্নের জগত সৃষ্টি করেন যা এই জীবন-সংগ্রামকেও অন্য অর্থ দান করে । একজন হেডমাস্টারের পেশা বর্ণনায় তিনি যতটা না আগ্রহী ত ার চেয়েও বেশি নজর দেন তাঁর নারীসঙ্গরীনতার দিকে । একজন উকিলের পেশাগত কর্মকান্ডের চেয়ে তার মতৃ মানুষের সান্নিধ্য লাভের দিকটি বেশি গুত্ব পায় । অথচ ছোট ছোট আঁচড়ে তিনি বাস্তব প্রেক্ষিত ফুটিয়ে তোলেন চরম মুন্সীয়ানায় । তাঁর গল্পের নায়ক-নায়িকারা শহর থেকে অনেক দূরে কোনো মনোরম নৈসর্গিক পরিবেশে রম্যান্সের সন্ধান করে না । বরং স্বপ্ন ও বাস্তবের যন্ত্রণাময় টানাপোড়েন অস্থির হয়ে ওঠে । রিয়লিজম ওরম্যান্টিসিজমের মিশ্রণে জীবনানন্দ তাই এমন একটি ভুবন তৈরি করেন যা পরিচিত হয়েও অপরিচিত মনে হয় । আজকের পরিভাষায় যাকে ডিফ্যামিলিয়ারাইজশন (defamiliarisation) বলা হয়, ত ার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ মেলে জীবনানন্দের আখ্যানশৈলীতে ।

তাঁর সংলাপও এই মিশ্রণ প্রক্রিয়ায় একটি বিশেষ ভূমিকা নেয় । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংলাপ এগোয় ছোট ছোট কথায়, কখনও অসম্পূর্ণ বাক্যে। প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে বড় দ্রুতগতিতে, যেমন হয় দৈনন্দিন জীবনে । কখনই গুছোনো সংলাপের চেষ্টা নেই । অথচ হঠাৎ এমন কথা, এমন শব্দ হাজির হয় যা তুচ্ছ আলাপে এক গভীর ব্যঞ্জনা এনে দেয় । 'মায়াবী প্রাসাদের' উদ্ধৃত উক্তিটি যেমন । 'বাসনার দেশে' আর একটি উক্তি ঃ ছেলেটি গেল এক অন্ধকারে, আমি এক অন্ধকারে, অ ার তুমি অন্য এক মানুষ কি না, যাও । অন্ধকারে সাঁধাও গিয়ে ।' কোনো গল্পে আবার সংলাপই নেই, আছে এক বিলম্বিত আত্মকথন, যেমন 'কণার পথ ধরে' । বে ঝাই যায় জীবনানন্দ প্রথাগত বাস্তববাদী ভাষা ও ভঙ্গি করে এক অব্যক্ত ও অনির্বচনীয় মনোজগতের তর খুঁজে চলেছেন । এই খোঁজার অন্য একটি ভাষা হল

বিশেষ কোনো কাজের অনুপুঙ্খ, পুনরাবৃত্তি, যেমন প্রকাশের আহারের বর্ণনা বা শচীর সেলাই মেশিনের কাজ (গ্রাম ও শহরের গল্প), বা বিশেষ কোনো বস্তুর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ, যেমন মাছি (মৃণাল) । শুধু প্রতীকী ব্যঞ্জনায় নয়, 'ভিসুয়াল' বিসেবে এসব এতই সিনেম্যাটিক যে মনে হয় আধুনিক কোনো চিত্র-পরিচালকের চোখ দিয়ে আমরা দেখছি । জীবনানন্দ প্রায় একশর কাছাকাছি গল্প লিখেছেন, তার সব কটিই সমান মানের নয়, কিছু অসম্পূর্ণ বলেই মনে হয় । কিন্তু সন্দেহের অবকাশ নেই যে গল্প লেখার সময় জীবনানন্দ দায়বদ্ধ ছিলেন নিজের কাছে, কোনো প্রচলিত ঘরানা বা কোনো নব্যধারার প্রতি নয় । এই আত্মমগ্নতা তাঁর গল্পকে যে-অনন্যতা দান করেছে তার সম্পূর্ণ মূল্যায়নের সময় এখনও আসে নি ।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com